ড. মিহির কুমার রায়

বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তিযুদ্ধ ও শিক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ

শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড— এ কথাটি এখন কারও মুখে শোনা যায় না, অথবা কোনো বিলবোর্ডেও দেখা যায় না। বরং এর পরিবর্তে রাজধানী শহর কিংবা বিভাগীয় শহর/জেলা শহরের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ভর্তির ব্যাপারে অনেক রঙিন ব্যানার দেখা যায়। এছাড়াও বিশেষত রাজধানী শহরে ব্যক্তিমালিকানায় প্রতিষ্ঠিত অনেক স্কুল-কলেজের ছবিসহ রঙিন বিলবোর্ড দেখতে পাওয়া যায়। তাছাড়াও টেলিভিশনে দেশের ব্যক্তিমালিকানায় প্রতিষ্ঠিত আবাসিক/অনাবাসিক স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর কারুকার্যমণ্ডিত অনেক বিজ্ঞাপন দেখতে পাওয়া যায়। এসবের মুখ্য উদ্দেশ্য হল শিক্ষার্থীদের আকৃষ্ট করা। ভর্তি প্রতিযোগিতার অংশ হিসেবে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পক্ষে বিভিন্ন ধরনের ছাড়ের ঘোষণাও দেয়া হয়। সম্প্রতি দেশের সব বোর্ডের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফল একসঙ্গে প্রকাশিত হয়েছে এবং তুলনামূলক বিচারে এ বছরের ফলাফল কিছুটা খারাপ হয়েছে সত্য, তবে এবারও জিপিএ-৫ প্রাপ্ত শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৫৫ হাজারের ওপরে রয়েছে— যারা বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তিযুদ্ধে অবতীর্ণ হবে নিজেদের ভবিষ্যৎ গড়ার স্বপ্নে। এর বাইরেও উদ্বিগ্ন শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় বা কলেজে ভর্তির আশা পোষণ করে নিজেদের আর্থিক সঙ্গতির কথাটি বিবেচনায় রেখে। এর মাঝামাঝি সময়ে অর্থাৎ 'উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার পর থেকে ভর্তির আগ পর্যন্ত শহরের কোচিং সেন্টারগুলো ভর্তিচ্ছু ছাত্রছাত্রীদের ভর্তিযুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার প্রস্তুতি স্বরূপ কোচিং বাণিজ্য করে যাচ্ছে অত্যন্ত লাভজনকভাবে।

আগামী কয়েক মাসের মধ্যেই বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ২০১৪ শিক্ষাবর্ষে ভর্তিচ্ছু ছাত্রছাত্রীদের ভর্তি পরীক্ষার ভিত্তিতে ভর্তি প্রক্রিয়া শুরু করা হবে। বর্তমানে দেশে সরকারি-বেসরকারি মিলে প্রায় ১০৪টি বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে এবং দেশের সার্বিক উচ্চশিক্ষার সুযোগ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, একই পরীক্ষার্থীকে একাধিক প্রতিষ্ঠানে ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হয়। এর জন্য ভর্তিচ্ছু পরীক্ষার্থীদের নির্দিষ্ট পরিমাণ ভর্তি ফি প্রদান করে ফরম পূরণ করতে হয় এবং পরে তাদের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে যেতে হয়, যা অনেকাংশে ব্যয়বহুল ও কষ্টসাধ্য। তারপরও যারা সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সীমিত আসনে ভর্তির সুযোগ পেয়ে যায় মেধার ভিত্তিতে, তারা তুলনামূলক কম খরচে পড়াশোনার বিরল সুযোগটি পেয়ে যায়। তবে কিছু কিছু বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশিত যোগ্যতা অনুযায়ী আবেদন করার পরও আবেদনকৃত সবাই ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারে না। এতে করে সাধারণ মানুষের কাছে উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর শিক্ষক, প্রশাসন ও পদ্ধতিগত ভাবমূর্তি প্রশ্নের সম্মুখীন হয়।

দেশে বর্তমানে ৩৪টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে অনলাইন ভিত্তিতে ভর্তির জন্য আবেদন করা হয় এবং এ

ফরম পূরণ করতে যে ধরনের কম্পিউটার দক্ষতার প্রয়োজন হয় তা সিংহভাগ মফস্বল শিক্ষার্থীদের মধ্যে থাকে না। আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটের কারণে এ সুযোগে একশ্রেণীর ব্যবসায়ী অনলাইন সার্ভিস দিয়ে রমরমা ব্যবসা চালিয়ে যায়, যা শিক্ষার্থীদের জন্য একটা বাড়তি খরচ। বিষয়টি এখানেই শেষ নয়, যারা সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়, তারা সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় কলেজগুলোতে ভর্তির জন্য প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয় এবং সেখানেও অনলাইন পদ্ধতিতে ভর্তির আবেদন করতে হয় শুধু একটি মাত্র কলেজ থেকে। ফলে পদ্ধতিগত কারণে নির্দিষ্ট সংখ্যক ছাত্রছাত্রী ভর্তির সুযোগ পায়। এতে যারা সরকারি মাধ্যমে আর সুযোগ পায় না, তারা প্রায় ৭০টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির জন্য ভিড় জমায় এবং সেখানেও দু-একটি বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়া ভর্তি পরীক্ষায় তেমন কোনো নিয়ম মানা হয় না। ফলে সাধারণভাবে জিপিএ ২.৫০ পেয়েই অনায়াসে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর বিভিন্ন অনুষদ যেমন— ব্যবসায় প্রশাসন, বস্ত্র প্রকৌশল, কম্পিউটার প্রকৌশল, ইংরেজি, আইন প্রভৃতি বিষয়ে ভর্তি হয়ে যায়। কিন্তু সমস্যাগুলো হল প্রথমত, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যেও ভর্তি ফি'র ব্যাপারে কোনো সমতা নেই, যে যার মতো ফি নির্ধারণ করে থাকে। দ্বিতীয়ত, শিক্ষার্থীদের বেশির ভাগ আসে মফস্বল থেকে, যারা বাংলা মাধ্যমে পড়াশোনায় অভ্যস্ত অথচ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার মাধ্যম হল ইংরেজি। তৃতীয়ত, বেশির ভাগ শিক্ষার্থীর আর্থিক সচ্ছলতা বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার খরচের সঙ্গে অসঙ্গতি বিধায় তাদের এক জীবনযুদ্ধে অবতীর্ণ হতে হয়। চতুর্থত, বেশির ভাগ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব ক্যাম্পাসসহ কোনো ছাত্রাবাস/ছাত্রীবাস নেই বিধায় শিক্ষার্থীরা নিজ দায়িত্বে মেস, হোস্টেল কিংবা বাড়ির রুম উচ্চহারে ভাড়া করে লেখাপড়ার কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে, যা একাধারে ব্যয়বহুল, অস্বাস্থ্যকর ও মানসিক বিকাশের সহায়ক নয়। এর ফলে তারা বিশ্ববিদ্যালয়ে জীবনের মধুর ক্ষণগুলো উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়। একই ঘটনাগুলো পরে ছাত্রছাত্রীদের জীবনদর্শন, আচরণ ও মানসিক বিকাশে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। পঞ্চমত, মানসম্মত শিক্ষা যা ছাত্রের ভবিষ্যৎ জীবনের একমাত্র পাথেয় বিশেষত প্রতিযোগিতামূলক চাকরির বাজারে, তা অনেক ক্ষেত্রে একটি পর্যায়ে ধরে রাখা যাচ্ছে না। যদিও পরীক্ষার ফলাফল দেখে এ ঘাটতিটুকু বোঝার কোনো উপায় নেই। এ ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের একই বক্তব্য। শিক্ষা নিয়ে বাণিজ্য হয় যেখানে, সেখানে শিক্ষা হল পণ্যের ভূমিকায় আর বেপারির ভূমিকায় শিক্ষক। এ সত্যটুকু এখন সরকার ও মালিকপক্ষ সবাই জানেন।

এ অবস্থার ভেতর থেকেই শিক্ষা ব্যবস্থাকে বের করে এনে ছাত্রদের কল্যাণে নিয়োজিত করতে হবে এবং অভিন্ন কাঠামোতে সার্বিক একাডেমিক ও প্রশাসনিক শিক্ষা কার্যক্রমকে নিয়ে আসতে হবে। এর মধ্যে প্রথম প্রয়োজন হবে সরকারের পক্ষে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন এবং বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে মালিকদের একাগ্রতা ও ঐকান্তিক ইচ্ছা। দ্বিতীয়ত, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে অভিন্ন নিয়মে ভর্তি পরীক্ষা পরিচালনা করা এবং বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ভর্তি ফিসহ সেমিস্টার ফি বাবদ খরচ একটি অভিন্ন কাঠামোতে নিয়ে আসা। তৃতীয়ত, মানসম্মত শিক্ষাদানের জন্য সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠদান আইন করে বন্ধ করা এবং বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে স্থায়ীভাবে বিষয়ভিত্তিক মানসম্মত শিক্ষক নিয়োগ করা। চতুর্থত, সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে বেতন কাঠামো থাকলেও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে অভিন্ন বেতন কাঠামো নেই এবং একই বিশ্ববিদ্যালয়ের একই পদে দুই শিক্ষকের বেতন ভিন্নতর পরিলক্ষিত হয়, যা মানসম্মনত শিক্ষার পরিপন্থী। পঞ্চমত, গরিব মেধাবী ছাত্রদের জন্য বিশেষ সুবিধা থাকলেও অনেক বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় তা মানতে চায় না। তাছাড়াও যেসব বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষার মাধ্যমে মেধার ভিত্তিতে ভর্তি পরিচালনা করে থাকে, সেখানে সমাজের সুবিধাবঞ্চিত ছাত্ররা অর্থের অভাবে আর ভর্তির সুযোগ পায় না। সেক্ষেত্রে কোটাপদ্ধতি চালুর বিষয়টি সক্রিয় বিবেচনায় রাখা যায় কি-না, তা সরকার ও মালিকপক্ষসহ সুধীজন বিবেচনায় রাখতে পারে। শিক্ষার আলো সমাজকে আলোকিত করবে, এ ধারণাটি আবার মাথা তুলে দাঁড়াবে সেই প্রত্যাশায় রইলাম।

ড. মিহির কুমার রায় : *অর্থনীতিবিদ ও গবেষক, সিটি ইউনিভার্সিটি, ঢাকা*